Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরণ্যক -এর আঞ্চলিকতা

Volume	46
Issue	3
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gias Shamim
Published online	June 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i3.334
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.334
Pages	১২৮-১৫২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘আরণ্যক’-এর আঞ্চলিকতা

Check for updates

গিয়াস শামীম *

তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০) কল্লোলীয় (১৩৩০) উত্তেজনা আত্মস্থ ও উপেক্ষা করে সমকালীন কথাসাহিত্যে সংযোজন করেন স্বতন্ত্র এক মানবচেতনা, ব্যক্তিক ও সামষ্টিক মূল্যবোধ, আবেগ-সংবেদনাময় কর্মপ্রবাহ এবং জ্যোতির্ময় মনন ও প্রজ্ঞা। ব্যক্তির অবিরাম বিনষ্টিকে নয়, বরং অনিঃশেষ সদ্ভাবনাকেই তিনি শিল্পধারায় সিঞ্চন করেছেন। শহর জীবনের বহুমাত্রিক চালচিত্র তিনি যেমন অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন, ঠিক তেমনি শহরবিচ্ছিন্ন অরণ্যলালিত অন্ত্যজ, অবজ্ঞাত ও প্রান্তিক বিপুল মানুষের কৌতূহলোদ্দীপক জীবনচিত্রও বাঙ্ময় করে তুলেছেন তিনি। *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসে তিনি চলচ্চিত্রিক টেকনিকে চিত্রায়ণ করেছেন সমকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসের জীবনাভিজ্ঞতা— বহির্ভূত স্বতন্ত্র অপরিচিত এক অরণ্যাঞ্চল; যার স্থানিকবর্ণিমার সঙ্গে বিচরিত মানুষের বোধ-বোধি, মনস্তত্ত্ব এবং ভাবভঙ্গির রয়েছে বিস্ময়কর সমন্বয় ও সহাবস্থান।

আরণ্যক উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে বিভূতিভূষণ অঙ্কন করেছেন বাংলার বাইরের এক অরণ্যজনপদের ছবি। বাংলা সাহিত্যে অরণ্যজীবন নিয়ে এর পূর্বে আর কেউ লেখেননি। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে অরণ্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই সমাজভিত্তিক। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অরণ্য-অভিজ্ঞতা ছিল না। বিভূতিভূষণই প্রথম অরণ্য ও অরণ্যনির্ভর মানুষের ব্যাপক ও বিশ্বস্ত জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত *আরণ্যকে*। এ-উপন্যাসে মানুষের দারিদ্রদীর্ণ ছবির সঙ্গে অরণ্য-প্রকৃতির উদার গম্ভীর অথচ ভয়াল ও ভয়ংকর সুদূর রূপের ছবি একাকার হয়ে গেছে। ‘এই উপন্যাসের তিনভাগ দখল করে আছে প্রকৃতি কিন্তু সবটাই দখল করে আছে মানুষ। মানুষের এমন গল্প বিভূতিভূষণও আর একটি লিখতে পারেননি। তিনি যে কত বড় শিল্পী ছিলেন তার পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে এখানে’।[১]

আরণ্যক উপন্যাসের গোত্র-নির্ণয় দুরূহ। এটিকে যেমন বলা যায় ভ্রমণকাহিনীধর্মী, ঠিক তেমনি বলা যায় দিনপঞ্জিধর্মী। আবার কোনো কোনো সমালোচক এটিকে

★ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্মৃতিকথাধর্মী উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত করেছেন। অবশ্য এ উপন্যাসে অল্পবিস্তর প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। একজন সমালোচক *আরণ্যক*কে রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত গণ্য করে লিখেছেন : "আরণ্যক' এক ট্র্যাজেডির চিত্রণ, 'আরণ্যক' এদেশের দীর্ণ হবার তৃণমূলের ন্যারেশন। দ্বন্দ্বময় দৃষ্টিকোণ থেকে বিভূতিভূষণ এ ট্র্যাজেডিতেই অঙ্গীভূত করেন প্রচ্ছন্নে, গভীর অন্তর্লীন স্তরে এক রাজনৈতিক বক্তব্যকে। ...এ কোন আদি কল্পস্বর্গের জন্য দীর্ঘশ্বাস নয়, অতীতচারিতা নয় : উনিশ শতক জুড়ে মধ্যবিত্ত আন্দোলন-কর্মকাণ্ড-উন্নতিভাবনার, ব্যর্থতার, ঔপনিবেশিক স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত হবার স্বীকারোক্তি— আর পাশাপাশি বাঁচবার, পুনরুজ্জীবনের শক্তির, বিকল্প ভাবনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত।[২] *আরণ্যকে* সত্যচরণের স্মৃতির স্রোতে এ রাজনৈতিক বক্তব্যই বাহিত হয়েছে।

আরণ্যক উপন্যাসের 'প্রারম্ভ পৃষ্ঠা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের চারিত্রবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন— "আরণ্যক'... কল্পনালোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে— উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়।" বিভূতিভূষণের ভাষ্য অনুযায়ী *আরণ্যক* 'কল্পনালোকের বিবরণ' হলেও সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। অর্থাৎ এর মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ আছে, যা স্মৃতিকথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। ফুলকিয়া-নাড়াবইহার-লবটুলিয়া-আজমাবাদের ভূ-অঞ্চল এবং সে-অঞ্চলের প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর জীবনযুদ্ধের কিংবদন্তীতুল্য কাহিনী কল্পরসে জারিত করে তিনি এ-উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। 'তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি', যা তিনি পনের-ষোল বছর পরও বিস্মৃত হতে পারেননি, তা-ই সত্যচরণের জবানিতে এ-উপন্যাসে শব্দরূপ দিয়েছেন তিনি।

*আরণ্যকে*র আদ্যন্ত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে অরণ্য-প্রকৃতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট মানুষ। বিহারের অন্তর্গত ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের স্থানিকবর্ণিমা ও যাপিতজীবন এ-উপন্যাসে অসাধারণ নৈপুণ্যে চিত্রায়ণ করেছেন বিভূতিভূষণ। দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী এবং অরণ্যনির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার অসামান্য রূপায়ণের কারণে এটি হয়ে উঠেছে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। নাগরিক মধ্যবিত্তমানসের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাবহির্ভূত ব্যাপ্ত-বৃহৎ দূরায়ত অঞ্চলের স্থানিকবর্ণিমা এবং সে অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবনবৈচিত্র্য এ-উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ শিল্পাবয়বে অঙ্কিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *আরণ্যকে* উপস্থাপিত অরণ্যাঞ্চলের সান্নিধ্যে আসেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এ-সময় তিনি কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্তি পান ভাগলপুরে। 'থাকতেন মোগশরপল্লীর যে বাড়িটিতে, তার নাম বড়বাসা। আর যেতে হত ইসমাইলপুরে, ঘোষ এস্টেটের জঙ্গলমহালের কাজ দেখতে। জঙ্গলমহালে নাকি পুকুর চুরি হচ্ছে, মহালের আয় ক্রমশ কমছে, এই মর্মে কলকাতায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের কাছে চিঠি পাঠান মহালের সুপারিনটেনডেন্ট সারদাকান্ত চক্রবর্তী। তাঁর দরকার একজন বিশ্বস্ত সহকারীর। সেই কারণেই বিভূতিভূষণ ঘোষ এস্টেটের কর্মচারী হয়ে এসেছেন বিহারে'।[৩] প্রায় ছয় বছর দক্ষিণ বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জঙ্গলমহালের তদারকিতে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। এ-অরণ্যজীবনের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে বিভূতিভূষণ রচনা করেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *পথের পাঁচালী*।[৪] পক্ষান্তরে অরণ্যজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি যখন কলকাতায় খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউটে শিক্ষকতা করছিলেন তখনই রচনা করেন *আরণ্যক*। জঙ্গলমহালের অভিজ্ঞতা তখন কেবলই সুদূরের স্মৃতি।

বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত দিনলিপি *স্মৃতির রেখায়* (১৯৪৬) পূর্ণিয়া-ভাগলপুরের বিচিত্র তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, তিনি জঙ্গলমহাল অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনার আকাঙ্ক্ষা অনেক আগে থেকেই লালন করেছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ তারিখ তিনি লিখেছেন :

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো— একটা কঠিন শ্যৈর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো অন্ধকার— এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। ... এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি— এইসব।[৫]

বলা যায় তাঁর এ-আকাঙ্ক্ষারই শিল্পিত প্রতিভাষ্য *আরণ্যক*।

আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণের মানস প্রতিনিধি সত্যচরণ। তার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে চিত্রায়িত হয়েছে ফুলকিয়া লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের অরণ্য-ভূভাগ এবং তার অন্তর্গত মানুষের বিচিত্র চলচ্ছবি। এ-উপন্যাসে বর্ণিত ভূচিত্রের শতভাগ তাঁর কল্পলোক উৎসারিত নয়, বরং অনেক কিছুই পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগৎ থেকে আহৃত। জনৈক গবেষক-সমালোচক *Annual Report on Survey and Settlement Operations* (1926) under the control of the

Director of the Department of Land Records and Surveys Bihar and Orissa for the year ending 30th September 1925. Patna; J. Bryne-এর *Bengal District Gazetteers : Bhagalpur* (1911). Bengal Secreteriat Book Depot, Calcatta; এবং L.S.S.O'Malley-এর *Bengal District Gazetters : Purnea* (1911). Bengal Secreteriat Book Depot, Calcatta প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যসূত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন *আরণ্যকে* অঙ্কিত ভূদৃশ্যের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাঁর নিরীক্ষালব্ধ তথ্য উপস্থাপনের পূর্বে *আরণ্যক* উপন্যাসের একটি এলাকায় জঙ্গলমহালের যে ভৌগোলিক পরিসীমা প্রদত্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে :

> উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর- পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত, পূর্বে কুশী নদী... যে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে।

বিভিন্ন গেজেটিয়ারের বর্ণনা এবং বার্ষিক রিপোর্ট পরীক্ষা করে উপর্যুক্ত গবেষক-সমালোচক *আরণ্যকে* বর্ণিত এই ভূ-অঞ্চলকে বাস্তবতার সঙ্গে প্রায় অঙ্কের মতো মিলিয়ে দিয়েছেন :

> মানচিত্রের হিসাবে যেটুকু বুঝি, জায়গাটা কুশী নদীর দক্ষিণে আর গঙ্গার উত্তরে, ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশে। পূর্ণিয়াতেও খুবই সম্ভব ছিল মহালের বিস্তার। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের বিবরণ থেকে যে নামগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেসব স্থান বেশির ভাগই ভাগলপুরে। ১৯৩৭ সালের মানচিত্রে... ইসমাইলপুর আছে গঙ্গার দক্ষিণে। কিন্তু আরও পুরনো মানচিত্রে গঙ্গার উত্তরেই ইসমাইলপুর পাওয়া যাচ্ছে। কাছাকাছি আছে লবটুলিয়া। ইসমাইলপুর কাছারী আর লবটুলিয়ার মাঝখানে সাত আট মাইল লম্বা যে উঁচু রাঙামাটির ডাঙার উল্লেখ আছে উপন্যাসে, ঠিক তেমনি ইসমাইলপুর আর লবটুলিয়ার মধ্যবর্তী একটা উঁচু জমির আভাস মানচিত্রে মেলে...। যাকে বলে দিয়ারা উপত্যকা, 'আরণ্যক' যেমন এক প্রান্তরের কাহিনীই বলছে, এমন অনুমান অসংগত নয়। নদী যখন তার গতিপথ বদলায়, নদীর আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে গেল যে জমি, সেই চর হলো দিয়ারা। যে নদী গতিপথ পরিবর্তনে অভ্যস্ত, তার চরে দিয়ারা গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আবাদের পক্ষে দিয়ারা উর্বর বটে, তবে বড় অনিশ্চিত। কোন মুহূর্তে নদী আবার তার প্রাকৃত খেয়ালে দিয়ারাকে আবৃত করে দেবে, তা কেউ জানে না। তাই সেখানে আবাদের ঝুঁকি নিতে সহজে ভরসা পায় না মানুষ। তখন দিয়ারা হয়ে ওঠে পশুচারণের সব থেকে উপযুক্ত জমি। ভাগলপুরের উত্তরাঞ্চলে যে

এমন জমি ছিল, সে কথা ১৯১১-র 'ভাগলপুর গেজেটিয়ারে' ব্রাইন লিখেছেন...। এখানকার নদীগুলির খামখেয়ালি স্বভাব খানিকটা বোঝা যাচ্ছে, যখন দেখছি কয়েক বছরের ব্যবধানে গঙ্গা ইসমাইলপুরের দক্ষিণ থেকে সরে গেছে সেই একই জায়গার উত্তরে। কুশী নদীর অনিশ্চিত গতিপ্রকৃতি ১৯১১-র 'ভাগলপুর গেজেটিয়ার'... এবং 'পূর্ণিয়া গেজেটিয়ারে'র সূত্রে জানা যায়। আরো পরে বিহার-উড়িষ্যার সার্ভে-সেটলমেন্ট বিভাগের ১৯২৪—২৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে... দেখছি, ৪৪৫ বর্গমাইল কুশী দিয়ারার প্রাথমিক বন্দোবস্ত অনুমোদিত হয়েছে। তার মধ্যে ৩৬০ বর্গমাইল ভাগলপুরে এবং ৮৫ বর্গমাইল পূর্নিয়ায়।... খেলাত ঘোষ এস্টেটের সীমানা কী ছিল, তার আরো সঠিক নির্দেশ সন্ধান ভবিষ্যতের জন্য বাকি রইল। তবু মনে হয়, ওই ৩৬০ বর্গমাইলের মধ্যে, কি তার আশপাশেই আমাদের সত্যচরণের গতিবিধি ছিল, এমন অনুমানে খুব বড় কোনো ভুল নেই'।[৭]

স্পষ্টত একটি বিশেষ অঞ্চলের আর্থসামাজিক-ভৌগোলিক বাস্তবতাই *আরণ্যক* উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেখা যায়— কলকাতাবাসী ময়মনসিংহের জমিদারপুত্র সতীর্থবন্ধু অবিনাশ কথোপকথনসূত্রে কর্মহীন সত্যচরণকে অপ্রত্যাশিতভাবে জানিয়ে দেয়—

আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?... জমিদারির ঘুণ কর্মচারী আমরা চাইনে— কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজি হয়ে যাও-... (প্রথম পরিচ্ছেদ : ১)

একদিকে অবিনাশের উদার সৌজন্যবোধ অন্যদিকে কর্মহীনতামুক্তির দুর্মর তাড়নায় সত্যচরণ জঙ্গলমহাল তদারকির জন্য চলে আসে পূর্ণিয়ায়; যেমনটি এসেছিলেন বিভূতিভূষণ, ভাগলপুরের মোগশরপল্লীতে। ট্রেনযাত্রা সম্পন্ন করে অতঃপর প্রচণ্ড শীতরাত্রিতে গরুর গাড়িতে চড়ে পনের-ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করবার পর সকালের সূর্যালোকে সে দেখতে পায় :

জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে— প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে— ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড় একটা দেখা যায় না— কেবল ছোটবড় বন, কোথাও

ঘন, কোথাও পাতলা মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই। (প্রথম পরিচ্ছেদ : ২)

শহরজীবনে অভ্যস্ত সত্যচরণের দৃষ্টিতে এতদঞ্চলের স্থানিক বর্ণিমা সম্পূর্ণ অভিনব ও স্বতন্ত্র। আজমাবাদ কাছারিতে পৌঁছেও সে পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারে না। কারণ :

কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভালো বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভালো। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়। (প্রথম পরিচ্ছেদ : ৩)

শাহরিক– সত্যচরণ যখন তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য চিন্তিত, জঙ্গলজীবনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, ঠিক তখনি বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্ঠ চক্রবর্তীর বক্তব্যে সে হয়ে ওঠে বিস্মিত ও বাকরুদ্ধ :

এখানকার কোনো মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলাদেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ।... বন্দুকটা রাত- বেরাত শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভালো নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। (প্রথম পরিচ্ছেদ : ৩)

মন যখন অত্যন্ত হতাশা-আক্রান্ত, তখন সত্যচরণের প্রতি অরণ্য বাড়িয়ে দেয় সান্ত্বনার হাত—

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানি চিত্রকর হকুসাই– অঙ্কিত একখানি ছবি।

... দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল। (প্রথম পরিচ্ছেদ : ৩)

সত্যচরণের এই প্রকৃতিমুগ্ধতা ক্রমশ রূপান্তরিত হয় মানবমুগ্ধতায়। সিপাহি মুনেশ্বর সিংয়ের সরল-অসহায়তা ও দারিদ্রের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে এতদঞ্চলের অরণ্যনির্ভর মানুষের সমগ্রস্বরূপ। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

... একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবেনা। আমার একখানাও কড়াই নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়াইর কথা কিন্তু হুজুর, বড় গরিব, একখানা কড়াইর দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই

হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়াই আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোকে রাতে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরিব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামে একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরিব। এত গরিব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগছিয়ার বাজার হইতে বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল ... তাহার হর্ষোৎফুল্লমুখের দিকে চাহিয়া আমার এই দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল। বেশ লোকগুলো, বড় কষ্ট তো এদের। (প্রথম পরিচ্ছেদ : ৪)

আরণ্যক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বিভূতিভূষণ যে জীবন-পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করেছেন তা নিঃসন্দেহে বৃহৎ বঙ্গের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অভিনব। এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান সত্যচরণের অভিজ্ঞতালোকে ভিন্ন। উপন্যাসে ভিন্ন পরিবেশলালিত অরণ্যনির্ভর মানুষের প্রাকৃত জীবনযাপনের সত্যস্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। এখানে আদ্যন্ত একক কোনো প্লট নেই। ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের অরণ্যবেষ্টিত প্রায় ত্রিশ হাজার 'দিয়ারা' জমি প্রজাদের মধ্যে বিলিবণ্টনপূর্বক মনুষ্যবসতিপত্তন এবং অতঃপর ভগ্ন হৃদয়ে সত্যচরণের কলকাতা প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই ঘটনাংশের অন্তরালে সত্যচরণের অন্তর্লোকে যে সংগুপ্ত বেদনাবোধ তা উপন্যাসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে অঙ্কন করেছেন বিভূতিভূষণ। তাই বলা যায় *আরণ্যকের* মূল বিষয় অরণ্যপ্রকৃতি ও তার মানুষের কথা এবং প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ার মর্মন্তুদ যন্ত্রণা। এতৎপ্রসঙ্গে সত্যচরণের বক্তব্য লক্ষ্যণীয় :

... আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনো ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা। (প্রস্তাবনা)

চাকরিবুভুক্ষিত সত্যচরণ চাকুরিসূত্রে এসেছে অরণ্যাঞ্চলের দায়িত্ব নিয়ে, কিন্তু অরণ্য ধ্বংস করতে গিয়ে স্বয়ং সে-ই বেদনায় পীড়িত— ব্যক্তিচিত্তের এ-দ্বন্দ্বই

আরণ্যকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয়। সত্যচরণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ উপনিবেশিত সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বকেই যেন স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'সভ্যতার অনিবার্য দাবীতে অরণ্য যখন শস্যক্ষেত্র এবং শিল্পের জন্য জমি ছেড়ে দেয়, তখন প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও মানব-সরলতার জন্য তিনি হাহাকার করেন, অথচ কুঠার সংযত করতে পারেন না। অরণ্যের পায়ের কাছে রাখেন ব্যথিত অনুতপ্ত হৃদয়ের একটি ক্ষমাপ্রার্থনার প্রণাম, 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও'।[৮]

আরণ্যক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ। সে-ই স্বয়ং উপন্যাসের কথক। তার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে ঘটনা ও চরিত্রের কথা, সে-অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনবাস্তবতার কথা। 'সরাসরি উপন্যাসে চরিত্রগুলি আসছেওনা, ঘটনাগুলি দেখানোও হচ্ছেনা, বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে অনেক দূরে বসে— দেশগত ও কালগত উভয় দূরত্ব থেকেই— দক্ষিণ বিহারের অভিজ্ঞতার গল্প বলছে সত্যচরণ কলকাতায় বসে, অভিজ্ঞতা ঘটে যাওয়ার পনেরো-ষোলো বছর পর। এই দূরত্বের ফলেই তার কয়েক বছরের নির্জনতাবাসের অভিজ্ঞতাকে বিশেষ প্যাটার্নে বিন্যস্ত করতে পারছে সত্যচরণ— উপন্যাসের কথক। সত্যচরণ বলছে উত্তম পুরুষের জবানীতে, আর সেই কারণেই সে হয়ে উঠেছে প্রতিফলক— অর্থাৎ তারই চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র এবং ঘটনাবলি রূপ নিচ্ছে। কিন্তু উপন্যাসের 'আমি'র বিষয়ের প্রতিফলনই একমাত্র কাজ নয়, কখনো সে নিজেই হয়ে উঠতে পারে বিষয়। 'আরণ্যক'-এর 'আমি' তাই কোথাও দ্রষ্টা আবার কোথাও দ্রষ্টব্যও। বন কেটে জেগে উঠছে যে বসতি– যে মানব-সমাজ– তার দ্রষ্টা সত্যচরণ, আবার সত্যচরণ নিজেই দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে যখন অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমপ্রসারিত প্রণয়ের কথা বলে সে, কেননা প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য সে দেখতে পায়, যে আনন্দ সে উপলব্ধি করে, সে তো প্রকৃতিতে নেই, সে আছে তার ভিতরেই। এইভাবে, বিষয় আর বিষয়ী, মানুষ আর প্রকৃতি, দেখা আর হওয়ার ছন্দময় বিন্যাসে গড়ে উঠেছে 'আরণ্যক'-এর শিল্পরূপ'।৯ এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ বটে, কিন্তু নায়ক-চরিত্র নয়। উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং অরণ্যপ্রকৃতি। অরণ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র। কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণকেও বদলে দিয়েছে অরণ্য। অরণ্যই প্রত্যেকটি চরিত্রে নিয়ে এসেছে স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাসন।

আরণ্যকে সমাবেশ ঘটেছে প্রচুর চরিত্রের। বয়স, আচরণ, অভিজ্ঞতা ও অর্থবিচারে এরা বিভিন্ন। উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গনু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা, রাসবিহারী সিং, ধাওতাল সাহু,

রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ পাঁড়ে, দোবরু পান্না বীরবর্দী, মুসম্মত কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী প্রভৃতি।

লবটুলিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ চরিমহালে মহিষ চরায় গনু মাহাতো। লবটুলিয়া থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে ধরমপুর, লছমানিয়াটোলায় তার বাড়ি। পাঁচটি মাত্র মহিষ সম্বল করে সে বিজন বনের গহিনে মহিষ-চরির খাজনা দিয়ে একা খুপরি বেঁধে মহিষ চরায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে কাটিয়ে দেয় তার ছোট্ট খুপরিতে। তার জীবনধারণাও অদ্ভুত। সে মনে করে যেহেতু তার পাঁচটি মহিষ আছে, সেহেতু সেগুলো চরাতে হবে; এবং যখন চরাতে হবে তখন জঙ্গলে কুঁড়ে বেঁধে থাকাটাই তার বিধিলিপি। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে বিশ্বাস করে উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেঁটে বেড়ানোর কথা, বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর গল্প। সত্যচরণ মনে করে, 'গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত– তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতির সম্বন্ধে একজন রীতিমতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মতো কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৫)

উপন্যাসে ক্ষমতা-কাঠামোর শীর্ষে দাঁড়ানো দুটো চরিত্র হচ্ছে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা এবং রাসবিহারী সিং। প্রথম জন মৈথিল ব্রাহ্মণ, এবং দ্বিতীয় জন রাজপুত। জাতকুলে পার্থক্য থাকলেও এদের আচার-আচরণে সাদৃশ্য বিস্তর। সত্যচরণকে এদের দুজনই নিমন্ত্রণ জানায় দুই পৃথক পুর্ণিমা তিথিতে; হোলির উৎসবে। বন্দুক ছুঁড়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করা, নজর দেয়া, ঘটা করে আহার্যের আয়োজন সবই হয় দু'বাড়িতে। নন্দলালের নিমন্ত্রণের কারণ ছিল একান্তই স্বার্থসংশ্লিষ্ট। সে তার পুত্রের চাকরির জন্য সত্যচরণকে ঘুষ প্রদান করতে চায়। প্রকৃত ধড়িবাজ বলতে যা বোঝায় নন্দলাল ওঝা ঠিক তাই।

রাসবিহারী সিং দুর্দান্ত মহাজন, কারো নদীর তীরবর্তী গবর্নমেন্টের খাসমহলের প্রজা। এ-অঞ্চলের দরিদ্র গাঙ্গোতাদের মহাজন সে। দরিদ্র প্রজাদের রক্ত শোষণ করে সে বড়লোক। 'রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরিব গৃহস্থ প্রজা থরথরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিশও নাকি রাসবিহারীর হাতে আছে। খাসমহলের সার্কেল

অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।' এমতাবস্থায় তার দাপট সীমাহীন। রাসবিহারী সিং-এর ধনৈশ্বর্যও অঢেল। তার গোয়ালে ঘাট-পঁয়ষট্টিটি গরু, আস্তাবলে সাত-আটটি ঘোড়া। বছরে সে আটশ মন গম পায়। তার বাড়িতে প্রতিদিন আশি-পঁচাশি জন লোক আহার্য গ্রহণ করে। তার বাড়ির একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার এত অগুনতি যে সেটিকে মনে হয় রীতিমতো একটি অস্ত্রাগার। এতৎপ্রসঙ্গে সত্যচরণের প্রতিক্রিয়া : 'বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজুল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভালো ছবি নাই, ভালো বই নাই, ভালো কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভালো থাকিয়া-বালিস-সাজানো বিছানাও নাই। দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ির পিছনের নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো, গৃহ স্থাপত্য অতি কুশ্রী। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা।... এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন কাজে লাগে?' (সপ্তম পরিচ্ছেদ : ১)

এতদঞ্চলের আরেক বিত্তবান লক্ষপতি মহাজন ধাওতাল সাহু। তার বয়স ষাটোর্ধ্ব; রোগা লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি। নওগাছিয়ায় তার বাড়ি। লক্ষপতি হয়েও সে অহংকারমুক্ত, সংকোচহীন। তাই দেখা যায়, পাত্রের অভাবে সে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তে কলাইয়ের ছাতু মেখে কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসে নির্দ্বিধায় ভক্ষণ করে। অথচ এ-অঞ্চলের প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সবাই তার খাতক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, টাকা ধার দিয়ে সে তা উসুলের জন্য কাউকে তাগিদ দেয় না। অনেকেই তাকে ফাঁকি দেয়। এজন্য সে উকিল-মোক্তার, কোর্ট-কাছারির দ্বারস্থ হয় না। একসময় যখন দলিলগুলো তামাদি হয়ে যায়, তখন অম্লানচিত্তে সে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে। জঙ্গলমহালের প্রয়োজনে একবার ধাওতাল সাহুর কাছ থেকে সত্যচরণ সাড়ে তিন হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করে। এজন্য সে কোনো দালিলিক প্রমাণপত্রের তোয়াক্কাও করেনি। সত্যচরণের স্বীকারোক্তি : 'সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুর নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায় ছ'মাস দেরি হইয়া গেল— এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহু আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে!' (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ১)

রাজু পাঁড়ে গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ; বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। লবটুলিয়া-বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রায় বিনামূল্যেই তাকে বন্দোবস্ত দেয়া হয় দু'বিঘা জমি। পরবর্তী দেড় বছর আজমাবাদ কাছারির ধারে-কাছেও সে আর আসেনি। এ-সময়ে সে মাত্র পনের কাঠা জমি চাষের উপযোগী করেছে, আর সামান্য চীনা ঘাসের দানা খেয়ে সে দিনযাপন করেছে। তার বাসস্থানে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নেই। একটা লোটাই তার সম্বল। তাতে রান্না হয় চীনা ঘাসের বীজ। রাজু ভক্ত পূজারি; তার খুপরির একধারে রয়েছে সিঁদুর-মাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি। বনের ফুল দিয়ে সে সাজিয়ে রেখেছে ক্ষুদ্র পাথরের বেদি। বেদির একপাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। সে হিন্দি জানে, সংস্কৃতও কিছু কিছু জানে। অবসর সময়ে সে গাছতলায় বসে বই পড়ে আর কী যেন লেখে। সত্যিকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু পাঁড়ে; কবি ও দার্শনিক। শুয়োরমারি বস্তিতে যখন কলেরা আরম্ভ হয়, তখন সে শিকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি নিয়ে এ বাড়ি- ও বাড়ি গিয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করে। বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাতেই সে তুষ্ট। সারাদিন সে খেত-খামারের কাজ করে। মহিষ চরিয়ে, পূজা-অর্চনা, রামায়ণ পাঠ, রান্না-খাওয়া, ভজন প্রভৃতি নিয়েই তার দিন কাটে। বহির্জগৎ সম্পর্কে সে নিস্পৃহ ও অজ্ঞাত। কলকাতার কথা শুনেছে বটে কিন্তু কোনদিকে তা সে জানেনা। তার ধারণা শহর খুব খারাপ জায়গা, চোর- গুণ্ডা-জুয়াচোরের আড্ডাখানা, সেখানে গেলে জাত থাকে না। অবশ্য রাজুর জীবন একেবারে রোমান্সশূন্য ছিল না। তার বয়স যখন আঠারো, তখন সে উত্তর ধরমপুর, শ্যামটোলাতে সর্জুর অধ্যাপক-পিতার টোলে ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে চতুর্দশী সর্জুর প্রেমে জড়িয়ে যায়। অতঃপর তাকে বিয়ে করে। সতের-আঠারো বছর বিপত্নীক জীবনযাপন করে জীবন সম্পর্কে সে হয়ে পড়ে নিরাসক্ত। তার দার্শনিক মন সর্বদা জটিল তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত। যে-কোনো বিষয়ে সে পরিচয় দেয় মৌলিক চিন্তা-চেতনার। তার বিশ্বাস- উইয়ের ঢিবি থেকে জন্ম নেয় রামধনু; নক্ষত্রদল হচ্ছে যমের চর, পৃথিবীতে মানুষ কী পরিমাণে বাড়ছে তা সরেজমিনে তদারক করবার জন্য যম কর্তৃক তারা প্রেরিত হয়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সম্পর্কেও তার রয়েছে একটা নিজস্ব ধারণা। জ্ঞান মানুষকে যে কতবেশি সাহসী করে তোলে তার দৃষ্টান্ত এই রাজু পাঁড়ে।

যুগলপ্রসাদ এক অসাধারণ চরিত্র। গাছ, ফুল-ফল, লতা-গুল্ম সম্বন্ধে তার জানার পরিধি ব্যাপক। ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহার-সরস্বতী কুণ্ডীকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত করতে তার প্রচেষ্টা অন্তহীন। পৃথিবীতে তার মতো

নিছক সৌন্দর্যের পূজারি বিরল। সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবার জন্য নিজস্ব অর্থ ও সময় ব্যয় করে। অথচ সে-বনভূমিতে তার নিজের ভূ-স্বত্ব বলে কিছুই নেই। পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, লছমিপুর, পাটনা, ধরমপুরের পাড়ে গাঁ, জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে বিচিত্র ফুল-ফল, লতা-গুল্ম সংগ্রহ করে জঙ্গলমহালকে সে করে তুলেছে সৌন্দর্যে অপরূপ, দৃষ্টিনন্দন। জঙ্গলমহালের সবাই যখন বৈষয়িক উন্নতির প্রচেষ্টায় মগ্ন, তখনও সে সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তৎপর। জমি-জমা, গরু-মহিষের আলোচনা সে ভালোবাসে না, তাতে যোগও দেয় না। বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনেই যেন এ পৃথিবীতে সে এক ধরনের ব্রাত্য মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

মটুকনাথ পাঁড়ে কর্মবিমুখ ও সংসার-উদাসীন একজন মানুষ। সে চাষবাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং জঙ্গলমহালের জমির প্রতি অনুৎসাহী। বংশানুক্রমে সে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তার উপর্যুপরি অনুরোধে সত্যচরণ আজমাবাদ কাচারির পাশে তার জন্য একটি টোল নির্মাণ করে দেয়। অতঃপর তার আনন্দ ও উৎসাহ হয়ে ওঠে সীমাহীন। সে সকালে স্নানাহ্নিক সেরে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুর পাতায় বোনা আসনের ওপর গিয়ে বসে, এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলে সূত্র আবৃত্তি করে; যেন সে কাউকে পাঠদান করছে। অথচ টোল ছাত্রশূন্য। টোলকে কেন্দ্র করে উৎসাহী-মটুকনাথ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাগেদবী সরস্বতীর প্রতিমা নির্মাণ করে, এবং পূজা প্রদান করে। অপ্রত্যাশিতভাবে মাস কয়েকের ব্যবধানে টোলে বেশকিছু ছাত্র ভর্তি হয়। কখনো মকাইয়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা, বাথুয়া শাক প্রভৃতি ভক্ষণ করে, আবার কখনো বা অনাহারে-অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। কিন্তু মটুকনাথের উৎসাহের অবধি নেই। এমতাবস্থায় সত্যচরণ টোলের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ দেয়। সে-জমিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভর করে টোলের ছাত্রদের প্রয়োজন নির্বাহ হয়। মটুকনাথের আন্তরিক অধ্যবসায় ও উদ্যমের কারণে টোলের অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রায় জন পনেরো ছাত্র টোলে ভর্তি হয়ে কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তার বৈষয়িক উন্নতিও সাধিত হয়। যজমানদের ঘর থেকে প্রাপ্ত গম ও মকাই রাখবার জন্য সে টোলের উঠানে একটা ছোট্ট গোলা নির্মাণ করে। কাচারির যে সব আমলা ও সেপাই এক সময় মটুকনাথকে পাগল বলে উপহাস ও উপেক্ষা করতো, তারা অতঃপর তাকে সম্মান ও সমীহ করে চলে।

১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোবরু পান্না বীরবর্দীর জীবনপরিণাম করুণ ও মর্মস্পর্শী। একসময় উত্তরে হিমালয় পাহাড়, দক্ষিণে ছোট নাগপুরের

সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গেরের অন্তর্বর্তী এলাকার সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল তার পূর্বপুরুষ। অথচ নিষ্ঠুর নিয়তির কারণে এখন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের উত্তর সীমানায় একটা ছোট্ট বস্তিতে তার বসবাস। এই এলাকার সমস্ত আদিম জাতি এখনো তাকে রাজার সম্মান দেয়; রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে। কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে হেরে, সর্বস্ব হারিয়ে অবস্থাবৈগুণ্যে এখন তিনি শিকার ও গোচারণকেই প্রধান উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আরণ্যকের তিনটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র হচ্ছে মুসম্মত কুন্তা, মঞ্চী ও ভানুমতী। কুন্তা হচ্ছে দেবী সিং রাজপুতের বিধবা স্ত্রী। একদা কাশীতে এক বাইজির বাড়িতে গান শুনতে গিয়ে কিশোরী কুন্তাকে দেখে মুগ্ধ হয় দেবী সিং। অতঃপর তাকে নিয়ে সে পালিয়ে আসে এবং বিয়ে করে। কুন্তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়ে দেবী সিং-এর আত্মীয় পরিজন তার সঙ্গে আহার-বিহার বন্ধ করে দেয়, এবং সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এক পর্যায়ে বাবুগিরি, সীমাহীন অপচয় আর মামলা–মোকদ্দমার কারণে দেবী সিং সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। বছর চারেক আগে সে অকালমৃত্যু বরণ করলে কুন্তা নিক্ষিপ্ত হয় চরম দুর্দশায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে লবটুলিয়ার কাছারিতে ইঁদারার পাশে কনকনে হিমবর্ষী আকাশের তলায় সে দাঁড়িয়ে থাকে সত্যচরণের 'পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙ্গা মাছের টুকরা, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারি ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধভাত'-এর জন্য। অথচ 'এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরি খেয়ে জল খেত'। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজপুত অথবা দেশওয়ালি গাঙ্গোতারা তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করেছে। অর্থনৈতিক হতদশার কারণে 'ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুকরি করে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে'। কিন্তু কখনো হাত পেতে ভিক্ষে করে না। সত্যচরণ হচ্ছে জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, তাই তার কাছ থেকে প্রসাদ-গ্রহণকে সে অপমান বলে গণ্য করে না। এক পর্যায়ে কুন্তার অসহায়তার সুযোগ নিতে চায় রাসবিহারী সিং। আশ্রয়ের নামে কুন্তার দিকে সে বাড়িয়ে দেয় তার লোভী হাত। কিন্তু কুন্তা আত্মসম্ভ্রম সুরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প : 'মেরে ফেল বাবুজী, জাত দেগা– ধরম দেগা নিহিন।' এই মনোজাগতিক সাহস ও পবিত্র অনুভূতিই কুন্তার কপালে অঙ্কন করেছে দুর্লভ জয়তিলক। তাছাড়া উপন্যাসে লেখক কুন্তাকে মানবীয় সংবেদনায় জাগ্রত এক অসাধারণ চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয় গিরধারীলালের

অসুস্থতার প্রসঙ্গ। গিরধারীলালের কুষ্ঠ হয়েছে মনে করে লবটুলিয়া-আজমাবাদের সবাই যখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছে, তখন কুন্তাই অবলীলায় তার দিকে প্রসারিত করেছে উদার সহানুভূতির হাত। দেবী সিং রাজপুতের স্ত্রী কুন্তা সাধারণ একজন গাঙ্গোতার সেবা করবে কিনা— এ-প্রসঙ্গ উঠতেই সে সত্যচরণকে উদ্দেশ্য করে অকপট দৃঢ়তায় উচ্চারণ করেছে : 'আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী। আমার জাতভাই কেউ এতদিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব! আমার আবার জাত কি?' এই বিশিষ্ট উচ্চারণ কুন্তাকে করে তুলেছে মানবীয় মর্যাদায় ভাস্বর।

মঞ্চী হচ্ছে কাটুনী মজুর বৃদ্ধ নকছেদী ভক্তের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী বধূ। সত্যচরণের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। চরম দারিদ্র সত্ত্বেও তার জীবনাকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। স্বামীর অপবুদ্ধির কারণে তার একমাত্র পুত্রটি মারা যায়। কিছুদিন পর অভিমান করে সে বৃদ্ধ স্বামীকে পরিত্যাগ করে কোনো এক রাজপুত যুবকের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাজকন্যা ভানুমতী। সে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর নাতির মেয়ে। 'ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী– তবে পরণের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। সে অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা; অথচ দিব্য সহজ-সরল মর্যাদাজ্ঞান। ভানুমতীর স্পর্শে সত্যচরণ প্রথম অনুভব করে নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য। তার মনে হয়, সে যখন স্নেহ করে তখন পৃথিবীতে খুলে যায় স্বর্গের দ্বার। স্বভাব-সারল্যের কারণে ষোড়শী, সুশ্রী, নবযৌবনা, কিশোরী ভানুমতী তার আয়নার অভাবের কথা ব্যক্ত করে সত্যচরণকে। জন্মাবধি তার বিচরণ চকমকিটোলার চৌহদ্দিতে। কখনো সে শোনেনি ভারতবর্ষের নাম। ভারতবর্ষ কোনদিকে তাও সে জানে না। কিন্তু জন্মাবধি সে শুনেছে একদা সারা পৃথিবীটা ছিল তাদের রাজ্য। ভানুমতীর সান্নিধ্যে সত্যচরণ তার ভাবনালোকে অনুভব করে উন্নতি ও আনন্দের সূক্ষ্মতর পার্থক্য :

মানুষ কি চায়— উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা— এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো– রস ঢুকিতে পারে না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা... ছেলেমানুষি গল্প করিত– আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশি রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বনমোরগের ডাক, বন্য হস্তীর বৃংহতি, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন! দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে— তার কত প্রমাণ পাইয়াছি।... ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া? (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : ২)

উপন্যাসের সব চরিত্র যে বিভূতিভূষণের জঙ্গলজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত তা নয়। কয়েকটি চরিত্র উপন্যাসে এসেছে তাঁর পরবর্তী-কালের অভিজ্ঞতাসূত্রে। ১৯৩৮ সনে পাটনায় সভা করে রাজগির যাওয়ার পথে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ নামে এক 'পাগল' কবির সাক্ষাৎ পান তিনি। উপন্যাসে এই কবিও ঠাঁই করে নিয়েছেন। আরণ্যকে বর্ণিত সুরতিয়া ও ছনিয়ার পাখি ধরার দৃশ্যও ১৯৩৮-এ কুঠির মাঠে দেখা।[১০]

আরণ্যকে পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনে যে সব চরিত্র এসেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গোষ্ঠ চক্রবর্তী, মুনেশ্বর সিং, বানোয়ারীলাল পাটোয়ারী, কণ্টু মিশ্র, গনোরী তেওয়ারী, জওয়াহিরলাল সিং, ব্রহ্মা মাহাতো, গিরধারীলাল, মুক্তিনাথ সিং, পূরণচাঁদ, রামচন্দ্র সিং, আশরফি টিণ্ডেল, রাসউল্লাস সিং, সুজন সিং, রাখাল বাবু, ধ্রুবা, নকছেদী ভকত, তুলসী, সুরতিয়া, ছনিয়া, রামধনিয়া টহলদার, দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা, ছট্টু সিং, বাঁকে সিং জমাদার, বুদ্ধু সিং, জগরু পান্না, আবদুল ওয়াহেদ, বলভদ্র সেপাই, রামলখিয়া প্রভৃতি। এই চরিত্রসমূহের পরিচয় পরিস্ফুট করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক অনিবার্যভাবে তাদের বিচিত্র স্থানিক, সামাজিক, ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে। 'যে-কোনো সমাজেই, জাত-চরিত্রের থেকে শ্রেণী-চরিত্রই যে বড়ো হয়ে ওঠে বিভূতিভূষণ তা নির্দেশ করতে ভোলেন নি। যদিও জাত-পাতের প্রবল প্রতাপের রূপও তিনি অঙ্কন করেছেন রীতিমত খুঁটি-নাটিসুদ্ধ। দোসাদরা হরিজন, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তারা যাবে, তবু তাদের উঠতে দেওয়া হবে না কাছারির বারান্দায়, কেননা তাহলে শুধু ব্রাহ্মণ বা ছত্রী নয়, গাঙ্গোতারাও কাছারির কোনো জিনিস খাবে না। অন্যদিকে গাঙ্গোতাদের ছোঁয়াও আবার খাবে না রাজপুত বা ব্রাহ্মণ, গাঙ্গেতিন মঞ্চীকে গরমজলের কুণ্ডে স্নান করতে দেবে না ব্রাহ্মণ পাণ্ডা; গাঙ্গোতা দ্রোণ মাহাতোর শিব পূজায় আপত্তি করবে ব্রাহ্মণ মটুকনাথ। রাজু পাঁড়ে বা গনোরি তেওয়ারি বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হলেও

লেখাপড়ার চর্চা ছাড়ে না, শ্রমজীবনে তাদের আগ্রহ নেই।[১১] দক্ষিণ বিহারের ক্ষমতা-কাঠামো এবং তার শ্রেণিগত রূপ ও জাতিগত বিভাজনের এ-ধারণা অর্জন করা যায় *আরণ্যকের* চরিত্রসমূহের বিচিত্রমাত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসূত্রে।

এখানকার অরণ্যপ্রকৃতিতে শীত এবং গ্রীষ্ম আসে অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে। শীতের তীব্রতা প্রতিরোধ করবার মতো ন্যূনতম গাত্রবস্ত্রও এতদঞ্চলের মানুষের নেই। তাই শীতরাত্রিতে আগুন জ্বালিয়ে তার খুব কাছে ঘেঁষে তারা বসে থাকে ভোর পর্যন্ত। এছাড়াও শীত প্রতিরোধের জন্য তারা এমন কিছু প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয় যা অভিনব ও বিস্ময়কর। নকছেদী ভকতের বক্তব্য লক্ষণীয় :

কলাইয়ের ভুসির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে আমরাও কলাইয়ের ভুসি গায়ে চাপা দিয়ে শুই।... অন্তত পাঁচমন ভুসি মজুত রয়েছে। ভারি ওম্ কলাইয়ের ভুসিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল... (দশম পরিচ্ছেদ : ১)

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ এখানে হাড়ে হাড়ে অনুভব করা যায়। এ সময় এখানে শুরু হয় দুর্বিষহ জলকষ্ট। প্রকৃতি হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। জঙ্গলমহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী বা বড় জলাশয় রয়েছে, সব শুকিয়ে যায়। এতৎপ্রসঙ্গে সত্যচরণের বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে– চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কার মতো তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝলসাইয়া বহিতেছে– সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনো দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক-এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়– এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়– কাছারি হইতে একশ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায় কুঁয়ামে পানি নেই যে, হুজুর। কোনো-কোনো দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বালতি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সেই ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ৩)

গ্রীষ্মের দুপুরে তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ, অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন হয়ে ওঠে ভয়ংকর। চতুর্দিক জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। আগুনের হলকার মতো তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝলসে দেয়। সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্রের এ রুদ্র–উত্তাপ কল্পনা করাও কঠিন। সত্যচরণের স্মৃতি-উৎসারিত প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ স্মর্তব্য :

গ্রীষ্ম দুপুরে কখনো এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না– তাম্রাভ, কটা– শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই– পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের! খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া... হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। সাহারা দেখি নাই, সোয়েন হেডিনের বিখ্যাত টাক্‌লা-মাকান্ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই– কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে-সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ৩)

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ও জলকষ্টের সঙ্গে কখনো কখনো এ-অরণ্যাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে দাবানল। ঘন নীলবর্ণ ধূম্ররাশি আর অগ্নিশিখা লকলক করে গ্রাস করে বহুদূর বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তর। সর্বগ্রাসী আগুন আতঙ্কিত করে তোলে অরণ্যের মানুষ, পশুপাখি সবাইকে। এতৎপ্রসঙ্গে সত্যচরণের দৃষ্টিকোণ উৎসারিত প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোশ দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল— ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি।...

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তারপরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ!... সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মতো বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—...

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্তী কর্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটা নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে— যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ৪)

দিগন্তবিস্তারী অরণ্য ও পর্বতের গাছগাছালি, লতাগুল্ম ও ফুল-ফলের অনুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে আরণ্যকে। যেসব গাছগাছালি এ-অঞ্চলের সৌন্দর্যকে অবারিত করে তুলেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বকাইন, কুল, কেঁদ, হরীতকী, বহেরা, কেলিকদম্ব, চীহড়, বনঝাউ, ফণিমনসা, অর্জুন,

গুড়মী পেঁপে, ধুঁধুল প্রভৃতি। যে সমস্ত ফুল এ-এলাকাকে করে তুলেছে দৃষ্টিনন্দন সেগুলো হচ্ছে : দুধলি, ধাতুপ, গোলগোলি, রক্তপলাশ, পিয়াল, বুনো তেউড়ি, কুসুম, বহেরা, বন্য চন্দ্রমল্লিকা, ছাতিম প্রভৃতি। এসব উপাদান এতদঞ্চলকে প্রদান করেছে অত্যাশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য।

ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহারে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে গম, কলাই, মকাই, জুম, জনার, চীনা ঘাসের দানা, সরষে প্রভৃতি। 'মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়– ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশি হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশি নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশি, গম তাহার অর্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।' (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ১)

ভাত এখানকার দুর্লভ বিলাসী খাদ্য। এখানে 'ধান একেবারেই হয় না– ধানের উপযুক্ত নাবাল জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও– এমনকি কড়ারী জমিতে কিংবা গবর্নমেন্ট খাসমহালেও ধান হয় না। ভাত জিনিসটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়— ভাত খাওয়াটা শখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চার জন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়।' (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ১) এখানে রোজ ভাত খায় নউগচ্ছিয়ার মাড়োয়ারিরা, রাসবিহারী সিং রাজপুতেরা। উৎসব-পার্বণে এদের বাড়িতে হতদরিদ্র মানুষদের ভাত জোটে। আজমাবাদের সদর কাছারিতে দুটো ভাত খাওয়ার প্রত্যাশায় বিনা নিমন্ত্রণে সাত-আটজন লোক ভীমদাসটোলা ও পর্বতা থেকে ন মাইল পথ হেঁটে এসেছে সত্যচরণের কাছে। এদের সাংবৎসরিক আহার্যের উপকরণ সম্পর্কে গনু মাহাতোর বক্তব্য স্মর্তব্য :

এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু লুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে— লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মতো ফল হয়; সে সময় এক মাস এ- অঞ্চলের যত গরিব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৫)

এছাড়াও এতদঞ্চলের মানুষের খাবারের তালিকায় রয়েছে চীনা ঘাসের দানা, শুঁটকি, কুচো চিংড়ি, নালসে পিঁপড়ের ডিম। 'লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তাছাড়া আছে কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ ফুল, পেয়ারা

ও বুনো শিম।' মটর শাক আর ঘাটোও রয়েছে এদের খাদ্য তালিকায়। সেদ্ধ মকাইকে বলা হয় ঘাটো। সুস্বাদু খাবারের মধ্যে রয়েছে পিঠা ও পেঁড়া।

এ-অরণ্যাঞ্চলে অভ্যর্থনার রীতিপদ্ধতি স্বতন্ত্র। সাধারণ গাঙ্গোতারা কাঁচা শালপাতায় একটা লম্বা পিকা বা চুরুট তৈরি করে অভ্যাগতের হাতে দিয়ে সসম্ভ্রমে স্বাগত জানায়। অবস্থাপন্নদের বাড়িতে অভ্যর্থনার রীতিপদ্ধতি অবশ্য ভিন্ন। নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার বাড়িতে পূর্ণিমা তিথিতে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় হাতি। অতঃপর সত্যচরণের বক্তব্য :

আমি বাড়িতে ছুকিতেই দুইবার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল।... সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বাড়িতে লইয়া গিয়া একটা বড়ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। ...তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল থালায় গোটা কতক আস্ত পান, সুপরি একটা মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর;...

তারপর খাওয়ানোর ব্যবস্থা।... প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতির কানের মতো পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।...

সন্ধ্যার পূর্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়ে বলিল— হুজুরের নজর। আশ্চর্য হইয়া গেলাম। থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ১)

লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের অরণ্যাঞ্চলে রয়েছে বিচিত্র জীবজন্তু ও পাখপাখালি। এ যেন এক অভয়ারণ্য। এখানে রয়েছে উড়ুক্কু– করাত-শঙ্খচিতি–অজগর সাপ, নীলগাই, বুনো শুয়োর, হায়েনা, ভল্লুক, চিতাবাঘ, আড়ন (বুনো মহিষ), বনমোরগ, ময়ূর, ঘুঘু, পাহাড়ি বনটিয়া, হরট্টিট প্রভৃতি। লেখকের পাখি-বিষয়ক বর্ণনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক :

সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখিও আছে এখানকার বনে! কত ধরনের, কত রং-বেরঙের পাখি– শ্যামা, শালিক, হরট্টিট, বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো– সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মানিক- পাখি, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখি– (অষ্টম পরিচ্ছেদ : ৩)

আরণ্যকে নানা সাংস্কৃতিক উৎসব-পার্বণের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। আজমাবাদ কাছারি থেকে চৌদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে কড়ারী– তিনটাঙায় প্রতি বছর ফাল্গুন

মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে। মহিষারড়ি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহলিখারূপ থেকে নারী-পুরুষ এ-মেলায় আসে। পাহাড়ের ঢালুতে শাল-পলাশের বন এ-উৎসবে হয়ে ওঠে সরগরম। এতৎপ্রসঙ্গে একটি বর্ণনাংশ নিম্নরূপ :

...দূরের নিকটের নানা স্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়ালফুল কি রাঙা ধাতুপফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই— তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানি কি জার্মানির সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলে মেয়েরা ভিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তিলেভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ২)

সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর রাজবাড়িতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় আয়োজিত ঝুলনোৎসবের বর্ণনাও প্রদত্ত হয়েছে এ-উপন্যাসে। এ-উপলক্ষে রাজবাড়ি হয়ে ওঠে উন্মুখর। এতৎপ্রসঙ্গে লেখকের যে বর্ণানাংশ তা একাধারে রোমান্টিক ও গীতময় :

সন্ধ্যার পূর্বেই একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল তাহাদের– পিছু পিছু আমরাও গেলাম– সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা! পূর্বদিকে নাওয়াদা লছমীপুরার সীমানায় ধনজরি পাহাড়,... কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ... গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন— এই গাছ অনেক কালের পুরানো— আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল— পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ...মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।...

কত রাত পর্যন্ত সমানভাবে নাচ ও গান চলিল...মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল— সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মতো তা সুশ্রী— একটি মধুর সঙ্গীতের মতো তার আকুল আবেদন। (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ৩)

প্রতি বছর ফসল তোলার মৌসুমে এতদঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় কাটুনির মেলা। এ সময় জঙ্গলমহালের দুই-তিন হাজার বিষা জমির সরিষা কর্তনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে প্রায় কয়েক হাজার খেতমজুর। উৎসবের আমেজে জেগে ওঠে পুরো এলাকা।

কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় ছট্ পরবের উৎসব। এটি এদেশের বড় উৎসব। এ-সময় দেখা যায়— 'বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কলবলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্ পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি কলরব, মেয়েদের গান— যেখানে নীলগাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাশি... শোনা যাইত সেখানে আজকাল কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসবদীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।' (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ১)

এই অভাবগ্রস্ত দারিদ্রপীড়িত অরণ্যাঞ্চলে বিনোদনের উপকরণ অতিসামান্য। এখানে বিনোদন হচ্ছে দারিদ্র-নিরাকরণের উপায়; টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ। তাই নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া অভাব-অনটনের দায় থেকে আত্মরক্ষার জন্য দলবলের সঙ্গে এসেছে আজমাবাদ; বিভিন্ন বয়সীর সঙ্গে একত্রে পরিবেশন করেছে 'হো হো নাচ আর ছক্করবাজি নাচ'; বিনিময়ে প্রার্থনা করেছে মাত্র চার পয়সা মজুরি। এছাড়া কাটুনী মেলার সময় মুঙ্গের জেলা থেকে এসেছে দশরথ। 'ননীচোর নাটুয়া' সেজে সে সবাইকে দিয়েছে আনন্দ; বিনিময়ে পেয়েছে টিকে থাকার ন্যূনতম অর্থ।

জঙ্গলমহালে বসবাসের জন্য যে বাসগৃহ নির্মাণ করা হয় সেগুলো আকারে-প্রকারে অভিনব। এগুলোকে বলা হয় খুপরি। কাশের বেড়ার খনিকটা কেটে তৈরি করা হয় দরজা-জানালা, যেগুলো বন্ধ করবার কোনো উপায়ই থাকে না। খুপরির ভেতরে ঢুকতে হয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। উপন্যাসের একটি এলাকায় বাসগৃহের যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

সব গৃহস্থের বাড়িই জঙ্গলের কাশ ছাওয়া, কাশডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশগাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের, বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়াছে ঘরে। (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ১)

অর্থনৈতিক বিবেচনায় এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে রয়েছে চমৎকার ঐক্য। এদের অধিকাংশই সহায়-সম্বলহীন, হতদরিদ্র, প্রায় কপর্দকশূন্য। কিন্তু এ-অসহায় মানুষগুলোও নানা জাতি ও বর্ণে-উপবর্ণে বিভক্ত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ গাঙ্গোতা জাতিভুক্ত। এদের উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন। অবস্থাপন্নদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন মৈথিল ব্রাহ্মণ। এরা অন্ত্যজ ও নিম্নবর্গের মানুষ তো দূরের কথা, অন্য ব্রাহ্মণের হাতের প্রস্তুত আহার্য গ্রহণেও অস্বীকৃত। এখানে বসবাস করে দোষাদ জাতিভুক্ত কিছু মানুষ। এদের ঘরের দাওয়ায় তুললেও ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলে দিতে হয়। তা না হলে কোনো ব্রাহ্মণ, ছত্রী অথবা গাঙ্গোতা সে সব জিনিস ভক্ষণ করবে না। এছাড়াও এখানে রয়েছে কিছু ভূমিহার ব্রাহ্মণ।

ধর্মীয় দিক থেকে এখানকার অধিবাসীদের প্রায় সবাই হিন্দু। এদের দেবতা হনুমান। উপন্যাসে এদের ধর্মানুভূতি সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য :

ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না— প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হুনমানজীর ধ্বজা থাকিবেই— এই ধ্বজার রীতিমতো পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা কুচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশি আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচার তত নাই আদৌ আছে কি না সন্দেহ... (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : ১)

ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের প্রাকৃত জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত। শিক্ষার আলোকবঞ্চিত হতদরিদ্র অরণ্যচারী মানুষ সার্বিক প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্বাচন করেছে নানা দেবতা-উপদেবতা। এরা বিশ্বাস করে ভূত-প্রেত, জিন-পরি, দৈত্য-দানোয়। বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে এদের আধিভৌতিক সংস্কার-বিশ্বাস উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসে। এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় রামচন্দ্র আমিন ও আশরফি টিণ্ডেল প্রসঙ্গ। এরা রাত্রির নিস্তব্ধ জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে কুকুর, মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মাথার চুল। মস্তিষ্ককোষের চেতন-অবচেতন স্তরে অবিরাম এসব উপকরণের উপস্থিতির কারণে রামচন্দ্র আমিন নিপতিত হয় উন্মাদদশায়। বোমাইবুরুর জঙ্গলে চরিমহালের ইজারাদার বালিয়া জেলার জনৈক বৃদ্ধের পরিশ্রমী পুত্র একই কারণে বেঘোরে প্রাণ হারায়। এমতাবস্থায় সত্যচরণের মনোভাবনা স্মরণীয় :

দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিদা কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া, উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এসব জায়গা ভালো নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রানীর মতো, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এসব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্নলোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনিধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ১)

এখানকার অরণ্যলালিত সরল মানুষের বিশ্বাস— গভীর রাতে সরস্বতী কুণ্ডীতে হুরপরীদের লীলা-উৎসব চলে। জ্যোৎস্নারাত্রে আলোকোদ্ভাসিত বৃক্ষরাজির শীর্ষদেশে ওড়ে হুরপরিদের শুভ্রবস্ত্র। আমিন রঘুবর প্রসাদের বক্তব্য স্মরণীয় :

... ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মতো জেগে আছে। (অষ্টম পরিচ্ছেদ : ৩)

লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের সর্বস্তরের মানুষ বিশ্বাস করে বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর প্রসঙ্গ। বন্য মহিষকে যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করাই তার দায়িত্ব। সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর বিশ্বাস—

টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারিরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন— কত লোক দেখেছে। (একাদশ পরিচ্ছেদ : ২)

বিভূতিভূষণ আরণ্যক উপন্যাসে অসাধারণ সাধারণতার সঙ্গে ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাড়াবইহারের আরণ্যক-জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। সহৃদয় আন্তরিকতা এবং অকৃত্রিম একনিষ্ঠায় তিনি প্রত্যেকটি ঘটনাংশ ও চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোনো আড়ম্বর বা ছলাকলার দ্বারস্থ হননি। ভাষা ব্যবহারে ও প্রকরণ-পরিচর্যায় তিনি একান্তই সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। 'কাহিনীতে তথাকথিত নাটকীয়তা নেই, একটানা প্লটের উত্থান-পতন নেই, অথচ মনকে টেনে রাখার এমন ক্ষমতা আর কেউ দেখাতে পারেননি তখনও।[১২] অরণ্যজীবনের এত অন্তরঙ্গ কাহিনী তাঁর পূর্বে তো নয়, পরেও কেউ শোনাতে পারেননি।

বিভূতিভূষণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংশয়ে সমাচ্ছন্ন শাহরিক কোলাহল থেকে মুক্ত করে *আরণ্যকে* নিয়ে এসেছেন জঙ্গল-জীবনের আস্বাদ; সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দময় সৌম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'নগর জীবনের বহিরঙ্গ জৌলুষ ও সমৃদ্ধির পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে হার্ডি যেমন ডরচেস্টার বা ডরসেটসায়ারের পল্লীর দারিদ্র্য-পিষ্ট সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনিয়ে সে যুগের পাঠককে মুগ্ধ করেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনি সমস্যাজটিল নাগরিক সমাজ থেকে বহির্গত হয়ে নাড়া বইহারের উদার শ্যামলিমায়, সরস্বতী-কুণ্ডীর স্নিগ্ধতায়... সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনিয়ে পাঠককে আনন্দ ও তৃপ্তি দান করলেন'।[১৩] এক অপরিচিত জগৎ ও জীবন এ-উপন্যাসে অনুভূতিময় সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আরণ্যকের বিশাল ক্যানভাসে চিত্রায়িত অরণ্য এবং অরণ্যনির্ভর মানুষের আচরিত স্বভাব ও মনোভাব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এখানকার অরণ্য শুধুই অঞ্চলবিশেষের অরণ্য। 'লবটুলিয়া বইহার, নাঢ়াবইহার, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট, মহলিখারূপের পাহাড় তাদের কাশ, কেঁদ, ঘাস, গাছ, ক্ষেত, চড়াই-উৎরাই, লোক-জন, রৌদ্র-বাতাস নিয়ে আলাদা, একক, 'ব্যক্তিক'। তিরিশের যুগে বাংলা সাহিত্যে এই ঝোঁক সুপরিস্ফুট। কালিন্দির চর, পদ্মানদীর তীর, লাল মাটির রাঢ় সবই বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, 'ব্যক্তিক'। তবু এই অঞ্চলগুলি পরিচিত জনবসতির আয়ত্তাধীন। বিশেষ জনবসতির চেহারায় এদের বিশিষ্টতা রূপ পায়। কিন্তু 'আরণ্যকে'র ব্যাপ্ত বিরাট অরণ্যে আচ্ছন্ন হয়ে সাধারণ রূপে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তা যায়নি'।[১৪] প্রকৃতিকে প্রকৃতি রেখেই তার মধ্যে ব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার দুরূহ কাজটি বিভূতিভূষণ অবলীলায় সম্পাদন করেছেন। এই প্রথম পাঠক অনুভব করলেন উপন্যাসের অভূতপূর্ব আস্বাদ, এবং সেই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসপ্রবাহে সংযোজিত হলো অরণ্যজীবনভিত্তিক একটি অসাধারণ আঞ্চলিক উপন্যাস–*আরণ্যক*।

তথ্যনির্দেশ

১. হাসান আজিজুল হক, বিভূতিভূষণের সাহিত্য : সৃষ্টির প্রকৃতি ও প্রভাব, *বিভূতিভূষণ ঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা* (সম্পাদনা : অরুণ সেন), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৭, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৩২

২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ৮১

৩. কিশলয় ঠাকুর, পথের কবি, দ্রষ্টব্য : রুশতী সেন, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*, পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ২০৭

৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *স্মৃতির রেখায়* ২৪ এপ্রিল ১৯২৮-এ লিখেছেন : 'আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন— এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'-তে পাঠিয়ে দিয়েছি। দ্রষ্টব্য : *বিভূতি-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৮৬, কলকাতা, পৃ. ৪৩২

৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতির রেখা, *বিভূতি-রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আরণ্যক*, বিভূতি-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪, কলকাতা, পৃ. ২৬; বর্তমান রচনায় *আরণ্যকের* পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৭. রুশতী সেন, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, প্যাপিরাস, ১৯৯৩, কলিকাতা, পৃ. ২৫-২৭

৮ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, *বিভূতিভূষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ১২৩

৯. সুতপা ভট্টাচার্য, উপন্যাসের ছন্দ-আরণ্যক, *কথাসাহিত্যের একলা পথিক– বিভূতিভূষণ*, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ২৬-২৭

১০. দ্রষ্টব্য : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, *বিভূতিভূষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১১. সুতপা ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

১২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, আরণ্যক পুনর্বিবেচনা, *বিভূতিভূষণের আরণ্যক : নানা চোখে* (সম্পাদক : তরুণ মুখোপাধ্যায়) রমা প্রকাশনী, ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ. ৩৩

১৩. ড. জীবনানন্দ গোস্বামী, *বিভূতিভূষণ এবং হার্ডি প্রসঙ্গ : উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ১৫

১৪. চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ, প্রাগুক্ত